প্রথম অধ্যায়

সমাজভাষাবিজ্ঞানের স্বরূপ ও সীমানা

সুদূর অতীতে আমাদের প্রপিতামহরা জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় বাস করতো। মানব সভ্যতার সেই প্রথম লগ্নে মানুষ কীভাবে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করত সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। তবে কোনো একটা মাধ্যমে যে তাদের ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নৃতত্ত্ববিদগণ প্রাচীন গুহা চিত্রে আদিম মানুষের শিকার করা, খাদ্য গ্রহণ প্রভৃতির ছবি আবিষ্কার করেছেন। ঐসব গুহাচিত্র থেকে অনুমান করা যায়, সেদিনের মানুষ তাদের মনের ভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিল নানা উপায়ে। মনের ভাব প্রকাশের যথাযথ মাধ্যম অনুসন্ধান করতে করতে একটা সময়ে এসে মানুষ কথা বলতে শিখে যায়, অর্থাৎ ভাষাকে আয়ত্ত করে। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জঙ্গলের আর সব পশুদের সঙ্গেই চলত মানুষের বসবাস। ভাষা আয়ত্ত করার পর অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানুষ হয়ে যায় আলাদা। প্রাগৈতিহাসিক যুগে জঙ্গলের মধ্যেই তৈরি হয় একটা পৃথক সমাজ, মানব সমাজ। আমাদের প্রপিতামহরা বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চরিত ধ্বনির নিপুণ ব্যবহারের দ্বারা ভাষারূপ সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ভাষার উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজ। আদিম মানুষ ক্রমবিবর্তনের পথে ঠিক কোন স্তরে ভাষা সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছিল সে ইতিহাস অন্বেষণ করা বেশ কঠিন। তবে নৃবিজ্ঞানী হেলরি লুইস মর্গ্যান তাঁর ‘এ্যানসিয়েন্ট সোসাইটি ’ তে এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে নিম্নপর্যায়ের বন্যতার স্তরে মানব সমাজে ভাষার উদ্ভব হয়। তবে সেটা যে ঠিক কোন ভাষা অর্থাৎ আজকের পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে কোন ভাষাটির প্রত্নরূপ সেদিন নির্মিতি পেয়েছিল তা তিনি নির্দিষ্ট করে বলতে পারেননি। যে যাইহোক, সময়ের অভিঘাতে বা পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভাষার ক্রমবিবর্তন হয়েছে; তৈরি হয়েছে আজকের সমাজভাষার নানারূপ। মানুষের সামাজিক ইতিহাস থেকে জানা যায়, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষ তার আদিম অবস্থা থেকে একটু একটু করে সভ্যতার আলোয় আসতে থাকে। সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাবনা জগতেও পরিবর্তন আসতে থাকে। যে অনুসন্ধিৎসু মনের কারণে মানুষ সেই প্রাচীন গুহাবাস অতিক্রম করে আজকের এই উন্নততর অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে সেই মনেই একদিন ভাষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা তৈরি হয়েছিল। ভাষা কী ? জিজ্ঞাসু মন উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিল ভাষার স্বরূপকে। তারপর একদিন শুরু হয় ভাষাতত্ত্বের চর্চা।

ভাষাতত্ত্ব চর্চার প্রথম পথ প্রদর্শক হিসাবে আমরা যাঁদেরকে পাই তাঁরা হলেন প্লেটো, অ্যারিস্টটল, দিওনুথিয়স থাক্স, পাণিনি প্রমুখ। কিন্তু আমরা তাঁদের সবাইকে দার্শনিক হিসাবেই জানি।

দর্শনতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এঁরা ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রকৃত ভাষাবিজ্ঞানী বলতে আমরা যা বুঝি এঁরা কেউ তা নন। পৃথিবীর প্রথম ভাষাবিজ্ঞানী কে? নির্দিষ্ট করে বলার নয়। তা বলাও যায়নি। প্লেটো, অ্যারিস্টটল বা পাণিনিরা যখন ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন তখন ভাষা সম্পর্কে মানুষের এত সচেতনতা তৈরি হয়নি। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য অনেক নিত্য বিষয়ের মতো করেই ভাষাকে দেখা হত। আর সে কারণে ভাষাচর্চার বিষয়টি সেভাবে দানা বাঁধেনি। অ্যারিস্টটল বা প্লেটোরা ভাষার যে দিকটি নিয়ে একেবারেই আলোচনা করেননি তা হল এর গঠনগত দিক। ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে স্বীকার করে তার রূপ, রীতি, পদ্ধতি কেন্দ্রিক কোনো গঠনমূলক আলোচনা তাঁরা করেননি। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের ২০,২১ ও ২২ এই তিন অধ্যায়ে ভাষাকে আটটি ভাগে ভাগ করে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। পাণিনি 'অষ্টাধ্যায়ী' তে চার হাজার সূত্রের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেছেন। অ্যারিস্টটল, পাণিনি প্রমুখের ভাষা নিয়ে এই সব কাজ ভাষাবিজ্ঞানের কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করেনি। অ্যারিস্টটল, পাণিনিদের অনেক পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশে ভাষাবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর পৃথিবীর সব সভ্য দেশের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ভাষা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন।

ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা শুরু হওয়ার পর প্রবহমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে; গভীরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। জন্ম হয়েছে ভাষাবিজ্ঞানের একাধিক শাখার- ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, উপভাষাবিজ্ঞান, সমাজভাষাবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞান প্রভৃতি। ভাষাবিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান অন্যতম। অ্যারিস্টটল বা পাণিনি ভাষা নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁদের হাত দিয়ে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার যে সূত্রপাত হয়েছিল পরিবর্তীকালে ফার্দিনন্দ দা স্যোসুর, নোয়াম চমস্কি প্রমুখ তাকে পূর্ণ মাত্রা দেন এবং বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়। জার্মান ভাষাবিজ্ঞানীরা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন আরও অনেকেই। তাঁরা ভাষাকে নিয়ে আরও নানাবিধ চর্চায় ব্রতী হন। তাঁদের এই ক্রিয়াশীলতার সূত্রে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম হয় সমাজভাষাবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞান প্রভৃতির।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের স্বরূপ

ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রের ধারায় সমাজভাষাবিজ্ঞান বা Sociolinguistics একটি অতি নবীন শাখা। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লস এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে শাস্ত্রটির পথ চলার সূত্রপাত। Sociolinguistics শব্দটির বিকল্প রূপে ইংরাজি ভাষায় আরও কিছু শব্দ প্রচলিত আছে। যেমন Sociology of Language. শব্দটি ব্যবহার করেছেন জে. এ. ফিশম্যান। সমাজভাষাবিজ্ঞানের উপর তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের নামে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। '' তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের নাম '**Readings in the Sociology of Language'.**" [১] Sociology of Language এর একটি সহজ সংজ্ঞা দিয়েছেন উইলিয়ান ব্রাইট। তাঁর দেওয়া সংজ্ঞাটি হল-'' **The Sociology of Language is potentially a huge area, encompassing the full range of relations between language and society.**" [২]

Sociolinguistics বা Sociology of Language কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ রূপে ' সমাজভাষাবিজ্ঞান ' কথাটি বিশেষ ভাবে প্রচলিত। বাংলায় সমাজভাষাবিজ্ঞানের অনেক সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। যেমন রামেশ্বর শ' বলেছেন--''ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক আলোচিত হয় তাকেই আমরা সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান বলি।" [৩] আবার রাজীব হুমায়ুন সমাজভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হিসাবে বলেছেন- '' সমাজ-সংগঠন মাঝে মাঝে ভাষা-সংগঠনকে প্রভাবিত করে। ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় ভাষা-সংগঠনের ওপর সমাজ-সংগঠনের প্রভাব বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হয়, তাকে সমাজভাষাবিজ্ঞান বলে।" [৪] সংজ্ঞাগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় ভাষা ও সমাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানুষের ভাষা সংগঠন বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয় সমাজের দ্বারা। ভাষার উপর সমাজের নানাবিধ প্রভাব বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় সমাজভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রে।

মানুষ যে সমাজে বাস করে সেই সমাজ স্থান, কাল, পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়। কোনো নির্দিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট কোনো জনবসতির মধ্যে সামাজিক স্তর বিন্যাস লক্ষ করা যায়। মানব সমাজের বিচিত্র সব সমীকরণ মানুষের ভাষা সংগঠনকে প্রভাবিত করে। মানব সমাজ নানা শ্রেণিতে বিভক্ত । কখনো এই শ্রেণিভেদ তৈরি হয় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে--উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রভৃতি। আবার

কখনো জাতিভেদে সমাজভেদ তৈরি হয়--হিন্দু সমাজ, মুসলিম সমাজ, বৌদ্ধ সমাজ, খ্রিস্টান সমাজ ইত্যাদি। শিক্ষাভেদে, বয়স ভেদে, পেশা ভেদেও সমাজ ভেদ দেখা যায়। মানব সমাজের এইসব শ্রেণিভেদ সমাজভাষার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

বাংলা ভাষার বিভিন্ন সর্বনাম যেমন-আপনি, তুমি, তুই প্রভৃতির ব্যবহারে শিক্ষাগত যোগ্যতা ভেদে বৈচিত্র্য দেখা যায়। কোনো বিশেষ সম্মাননীয় ব্যক্তিকে অশিক্ষিত মানুষরা সহজেই তুমি সম্বোধনে কথা বলতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত মানুষ এই ভুল কিছুতেই করবে না। ''সার তোমার নাম কী''? প্রশ্নটি স্কুলের পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষক মহাশয়কে উদ্দেশ্য করে বলতে পারে। কিন্তু নবম, দশম শ্রেণির ছাত্ররা এই ভুল করে না। সদ্যকথা কথা বলতে শেখা কোনো শিশু তার বাবা-মা কে সহজেই 'তুই' সম্বোধন করতে পারে, কিন্তু বড় হওয়ার পর তার 'তুই' সম্বোধন 'তুমি' বা 'আপনি' তে পরিবর্তিত হয়ে যায়। 'আম্মা হাগু করবো' এমন কথা যখন কোনো শিশু তার মা'কে উদ্দেশ্য করে বলে তখন তা মানিয়ে যায়, কিন্তু কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মুখে এমন কথা শোভা পায় না। আবার 'খোকাবাবু যায় লাল যুতু পায়' ছড়াটিতে 'জুতো' শব্দের 'যুতু' উচ্চারণ তখনই মানায় যখন কোনো মা তার শিশু সন্তানকে ভোলানোর জন্য ছড়াটি বলে। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এমন কথা কখনোই মানাবে না। মানুষের বয়স ও ভাষার মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র বিদ্যমান। ভাষার গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশে নির্ভর করে বয়সের উপর। কারণ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সব কিছুরই পরিবর্তন হয়। ভাষাও সেক্ষেত্রে বাদ যায় না। একটি শিশুর ভাষা ও একটি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ভাষায় এজন্যই পার্থক্য তৈরি হয়। 'আজ কী রান্না করেছিস? বা 'তোর ছেলে কেমন আছে?' ইত্যাদি প্রশ্ন বিবাহিত মহিলাদের সাপেক্ষে অতি প্রচলিত বিষয়। অবিবাহিত মেয়েরা এই ধরনের প্রশ্ন একজন অপরজনকে করে না। বিবাহ নামক সামাজিক রীতি মেয়েদের জীবনকে আমূল বদলে দেয়। ফলত বিবাহের পূর্বে ও পরে মেয়েদের ভাষা ব্যবহারে বিরাট পার্থক্য পরিস্ফুট হয়। বিবাহিত ও অবিবাহিত নারী সমাজের ভাষা আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পাল্টে যায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা সংসারে রান্না থেকে সমস্ত কাজ নিজেরাই করে, কিন্তু উচ্চবিত্ত পরিবারগুলিতে সংসারের কাজ করে কাজের লোক, রান্নার লোক। ফলত 'তোদের বউ মা রান্নাবান্না জানে তো' জাতীয় কথার প্রচলন এখন তাদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না। বয়স, শিক্ষা, পেশা, সামাজিক পরিস্থিতি প্রভৃতি একজন মানুষের ভাষারীতির উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ফলত

প্রতি মূহুর্তে সমাজভাষার পরিবর্তন হয়। আমরা পারিবারিক জীবনে বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলি, বন্ধুদের সঙ্গে সেই ভাষায় কথা বলি না। স্ল্যাং এর ব্যবহার সহ অন্য অনেক বৈশিষ্ট্যে-মণ্ডিত হয় বন্ধুদের সঙ্গে বাক্যালাপ। মেয়েদের ভাষায় স্ল্যাং ব্যবহার তুলনায় অনেক কম। স্ল্যাং এর ব্যবহার ছাড়াও নারী পুরুষের ভাষা ব্যবহারে অন্য অনেক বিভিন্নতা চোখে পড়ে। রাস্তা দিয়ে একটা সুন্দরী মেয়েকে যেতে দেখে সহজেই কোনো পুরুষ বলতে পারে 'মালটা দারুণ তো'। কোনো মেয়ে চট করে এমন কথা বলতে পারে না। সে হয়তো রেখে ঢেকে বলে--'কী দারুণ দেখতে দ্যাখ।' কার স্বামী কত রোজগার করে, কার স্বামী কাকে কেমন ভালোবাসে, এইসব আলোচনা মেয়েদের মধ্যে বহুল প্রচলিত বিষয়। কিন্তু পরস্পরের বউ নিয়ে আলোচনা পুরুষ সমাজে খুবই কম। বয়স, লিঙ্গ, পরিস্থিতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, পেশা প্রভৃতির কারণে ভাষারূপের এই যে পরিবর্তন তার অন্তর্নিহিত রহস্যের অনুসন্ধান এবং তার স্বরূপ বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের নিয়মাবলীর দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞান শাস্ত্রের দিক দিয়ে বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। ফলত প্রশ্রয় পায় সমাজভাষাবিজ্ঞানের ধারণা। সমাজভাষাবিজ্ঞানে ভাষা সংগঠনের উপর সমাজ সংগঠনের প্রভাব আলোচনা করা হয়। ভাষা সংগঠনের উপর সমাজ সংগঠনের প্রত্যক্ষ প্রভাবকে চিহ্নিত করা এবং তার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ একজন সমাজভাষা বিজ্ঞানীর প্রধান আলোচ্য বিষয়।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানা

ভাষা-বৈচিত্র্যের স্বরূপ অন্বেষণ, কারণ বিশ্লেষণ ও তার উপযুক্ত বর্ণনা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য। সামাজিক সূত্র, সামাজিক সংগঠন এবং সামাজিক পরিস্থিতির সাপেক্ষে ভাষা সংগঠনের স্বরূপ পর্যালোচনা সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর বাইরে বহু ভাষা পরিস্থিতি, স্ল্যাং এর ব্যবহার, অপরাধ জগতের কোড ল্যাঙ্গুয়েজ, অশালীন ভাষা, একজন মানুষের মনের বিচিত্র গতির সাপেক্ষে ভাষাভেদ এসবই সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকার মধ্যে পড়ে। তত্ত্বগত দিক দিয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যায়, যথা—

ক. গোপন-সঙ্কেতের ভাষা

প্রায় প্রত্যেক শ্রেণির মানুষ গোপন বা সঙ্কেতের ভাষা ব্যবহার করে। ছাত্র সমাজ, সংসারী মানুষ, প্রাপ্ত

বয়স্কা নারী, অপরাধ জগতের মানুষ, যুব সমাজ প্রায় সবাই গোপন-সঙ্কেতের ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত। 'দানা খাইয়ে দোব'- এই বিশেষ শব্দবন্ধ কেবলমাত্র অপরাধ জগতের লোকেরাই ব্যবহার করে। তারা দানা বলতে বোঝায় বন্দুকের গুলিকে। আবার একে অপরকে অবাধে 'ভাই' বলে সম্বোধন অপরাধ জগতে বহুল প্রচলিত বিষয়। ছাত্র সমাজ, যুব সমাজ সামাজিক মূল্যবোধকে মান্যতা দিয়ে অশ্লীল বিষয়ে কথা বলার জন্য গোপন বা সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে। 'মেশিনটা ভালো'। কোন সুন্দরী মেয়ে সম্পর্কে এমন মন্তব্য যুব সমাজের মধ্যে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। 'বাবার প্রসাদ' কথাটি ছাত্র সমাজে 'গাঁজা' এই বিশেষ নেশাকর দ্রব্য সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়। শিক্ষিত মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় ঋতুবতী বোঝাতে 'আমি এখন **C.P.M.**' , 'আমি লাল পতাকা' প্রভৃতি শব্দবন্ধ প্রায়শ ব্যবহার করে থাকে। বিবাহিত পুরুষরা যে কোন পরিবেশে সহজেই একে অপরকে প্রশ্ন করে 'খেলাধূলা কেমন হচ্ছে?' এক্ষেত্রে 'খেলাধূলা' বলতে বোঝান হয় স্বামী-স্ত্রীর মিলনকে। গোপন বা সঙ্কেত ভাষা ব্যবহার করা হয় কোন অশ্লীল, অসামাজিক বা বেআইনি বিষয়কে গোপন করার জন্য। বলাবাহুল্য গোপন-সঙ্কেতের ভাষার অর্থ বোঝা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। বক্তা ও শ্রোতার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর এর অর্থ নির্ভর করে। যে কোনো ভাষার শব্দভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করে গোপন-সঙ্কেতের ভাষা। তাই সমাজের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এমন সব ভাষার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকাধীন বিষয়।

খ. ভাষা বৈচিত্র্য

পৃথিবীর সব দেশে, সব ভাষায় স্থান, কাল, পাত্র, লিঙ্গ, জাতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ভেদে ভাষা বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভাষার এক প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল এর বৈচিত্র্যময়তা। যে ভাষায় যত বেশি বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় সে ভাষাকে তত বেশি উৎকৃষ্ট হিসাবে স্বীকার করা হয়। ভাষার বৈচিত্র্য নির্ভর করে কোনো ভাষা কোনো সমাজে কত বেশি সংখ্যক মানুষ ব্যবহার করছে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক বৈচিত্র্য কত তার উপরে। ভাষা-বৈচিত্র্য নানা কারণে সৃষ্টি হতে পারে। 'মটোর সাইকেল' কথাটি একটু অল্প শিক্ষিত সমাজ ব্যবহার করে। শিক্ষিত সমাজে বিষয়টিকে 'বাইক' বলা হয়। স্বল্প শিক্ষিত সমাজে অনুষ্ঠান বাড়িতে খাওয়ার সময় 'ভাত দাও' বা 'ভাত দেবো' কথাটি বলা হয়। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ 'রাইস দিন' বা 'রাইস

দেবো' বলতেই অভ্যস্ত। মুসলমান সমাজ মাংসকে অনেক সময় 'গোস' বা 'গোস্ত' বলে থাকে। এদিকে পাশাপাশি বসবাসকারী হিন্দুসমাজ একথাটি ব্যবহার করে না। শিক্ষিত ভদ্র সমাজ স্ত্রী'র ভাইকে 'শ্যালক' বলেই পরিচিত করে। সাধারণ বাঙালি সমাজ কিন্তু 'শালা' বলতেই অভ্যস্ত। উদাহরণগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে ভাষা বৈচিত্র্য সৃষ্টির মূলে কাজ করে শিক্ষা, সামাজিক অবস্থা, লিঙ্গ, পেশা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ। ভাষা বৈচিত্র্য যে কোনো ভাষার শব্দভাণ্ডারকে দেয় উৎকর্ষতা ও ব্যাপ্তি। সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রাণ নিহিত রয়েছে ভাষা বৈচিত্র্যের মধ্যে। একজন মানুষ সব সময় একইভাবে কথা বলে না। একজন শিক্ষিত মানুষ তার সহকর্মীদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলে, তার পরিবারে সেভাবে বলে না। আবার বন্ধু মহলে সেই মানুষটার ভাষাছাঁদ বদলে যায়। ব্যক্তি ভেদে, ব্যক্তির পরিবেশ ভেদে, ব্যক্তির বিভিন্ন মনোভাব ভেদে ভাষার গঠন বদলে যায়। সমাজভাষাবিজ্ঞানে ভাষার এমন সব রূপভেদ নিয়েই বেশি গবেষণা হয়। তাই ভাষাবৈচিত্র্য সমাজভাষাবিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়।

গ. সামাজিক সূত্র ও ভাষা সূত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক

সামাজিক সূত্রের সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের সূত্রাদির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। সামাজিক সূত্র ব্যক্তির শব্দভাণ্ডারকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। যে কারণে অশিক্ষিত, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের মুখে স্ল্যাং এর ব্যবহার প্রচুর। কারণ তার সমাজ তাকে ওইরকমই শিক্ষা দিয়েছে। ফলত স্ল্যাং ব্যবহার ছাড়া তারা কথা বলতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বসবাসকারী বাঙালিদের ভাষায় প্রচুর হিন্দি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। এক্ষেত্রে মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভাষাছাঁদ ঠিক বাংলা ভাষার মতো হয় না। তারা তাদের অভ্যাস বশত হিন্দি বাক্‌রীতি অনুসরণ করে ফেলে। ব্যক্তির বুলিভাণ্ডারকে বিশ্লেষণ করলে ব্যক্তির সামাজিক পরিচয়ের তল পাওয়া যায়। উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া প্রভৃতি জেলার মানুষ কুকুর তাড়ানোর জন্য 'ছেই,' কথাটি ব্যবহার করে। আবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় এক্ষেত্রে 'হিড়িক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সমাজভাষাবিজ্ঞানের যথাযথ পাঠ নেওয়া থাকলে নির্দিষ্ট ব্যক্তি কোন জেলার মানুষ তা বুঝে নেওয়া যায়। সামাজিক সূত্র মানুষের ভাষার বোধগম্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমার মানুষ গরুর খেতে দেওয়ার পাত্রকে 'নাদা' বলে। বারাসাত মহকুমার মানুষ জিনিসটিকে 'ম্যাসলা' বলতেই অভ্যস্থ। ফলত বারাসাত মহকুমার মানুষ 'নাদা' কথাটির অর্থ বুঝতে

পারে না। সমাজভাষাবিজ্ঞানে সামাজিক অনুষঙ্গে'র সঙ্গে ভাষাসূত্রের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ঘ. বহুভাষা ব্যবহার

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে একাধিক ভাষা ব্যবহৃত হয়, আবার প্রত্যেক ভাষার একাধিক উপভাষা থাকে। এছাড়াও একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষি মানুষ একই এলাকায় বসবাস করার ফলে ভাষাগত নানা সমস্যা তৈরি হয়। আবার কোনো ভাষার উপর প্রচুর পরিমাণে অপর ভাষা-বৈশিষ্ট্য ছায়াপাত করে। এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন উপভাষার এবং পৃথক ভাষার মানুষ পাশাপাশি বাস করার ফলে একপ্রকার মিশ্র ভাষার জন্ম হয়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বর্তমানে এই প্রবণতা প্রচুর পরিমাণে লক্ষ করা যাচ্ছে। বাংলা ভাষা আর বিশুদ্ধ বাংলা নেই। বিশুদ্ধ বাংলা এখন খুব কম মানুষই ব্যবহার করেন। এমনিতে বাংলা শব্দভাণ্ডারে বিদেশি শব্দের পরিমাণ প্রচুর। বর্তমানে এই সমস্যা আরও বেড়ে গিয়েছে। এর ফল স্বরূপ বাংলা ভাষার নিজস্বতা গভীর প্রশ্ন চিহ্নের মুখোমুখি হয়েছে। এইসমস্ত বিষয় বর্তমানে সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হিসাবে উঠে আসছে। ভাষা সমস্যা অনুধাবন এবং তার কারণ অন্বেষণ সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা করে থাকেন। একটি দেশ বা রাজ্যের মানুষ একাধিক ভাষায় কথা বলার কারণে প্রশাসনিক কাজ, শিক্ষা ক্ষেত্রের কাজে কোন ভাষা ব্যবহার করা হবে তা নিয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এই ধরনের সমস্যার পর্যালোচনা সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানার মধ্যে পড়ে।

একজন সমাজ ভাষাবিজ্ঞানী সমাজভাষাচর্চা করতে বসে কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হবেন অর্থাৎ সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানা ঠিক কতদূর তা নিয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞানী ফিশম্যান একটি নির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে – ".. including not only language uses per se, but also language attitudes and overt behavours toward language and toward language uses."[৫] অর্থাৎ সমাজ সংগঠনের সঙ্গে ভাষা ব্যবহারের সম্পর্ক বিষয়ে যাবতীয় দিক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠীর সম্পর্কের মূলে থাকে সামাজিক অনুষঙ্গ ও সামাজিক মানুষের মনোভাব ও আচরণ।

ফিশম্যান ছাড়াও সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানা ও স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে

ভাষাবিজ্ঞানী ম্যাকডেভিট, উইলিয়ান ব্রাইট, উইলিয়াম লেবোভ, মৃণাল নাথ কিছুটা নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছেন। মৃণাল নাথ সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়কে চারটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। এগুলি হল-

ক. অন্যোন্য ক্রিয়াবাচক সমাজভাষাবিজ্ঞান (**Interactional Sociolinguistics)**

খ. পরস্পর সম্বন্ধি সমাজভাষাবিজ্ঞান (**Correlational sociolinguistics)**

গ. ভাষা পরিবর্তন এবং ভাষা সংযোগ সমাজভাষাবিজ্ঞান। **(Language change and language contact sociolinguistics)**

ঘ. ভাষা সমস্যার সমাজভাষাবিজ্ঞান (**Language problems sociolinguistics)**

সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানা ও স্বরূপ বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানী ডেলহাইমস সরাসরি কিছু বলেননি, তবে তিনি সমাজভাষাবিজ্ঞানের তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। যেগুলি পর্যালোচনা করলে এর সীমানা ও স্বরূপ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। উদ্দেশ্য গুলি হল–

ক. সমাজ সমান্তরাল ভাষাতত্ত্ব

খ. সমাজ বাস্তবতার ভাষাতত্ত্ব

গ. সমাজ ভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব

সামাজিক মানুষের ভাষা বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে জড়িত। সমাজে বিভিন্ন মানুষের ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার দিক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য। যদি দেখা যায় কোনো কারণে সামাজিক মানুষের ভাষায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে তবে সেই বিষয়ে আলোচনা গবেষণা ও সমাধানের সূত্র সন্ধান সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হতে পারে। একই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের ভাষায় বিভিন্ন রকম পার্থক্য দেখা যায়। একজন সমাজভাষাবিজ্ঞানী ব্যক্তি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ভেদে একজন ব্যক্তির ভাষায় যে পার্থক্য সূচিত হয় সে বিষয়ে আলোকপাত করবেন। সমাজ ভিত্তিক ভাষাতত্ত্বের বিষয়বস্তু হিসাবে তাঁর আলোচনায় উঠে আসবে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য কীভাবে নির্বাচিত ও শ্রেণিবদ্ধ হয়ে সামাজিক ক্রিয়ার প্রকাশক হিসাবে ভাষাকে নির্মিতি দেয় তার পর্যালোচনা।

দেশ বিদেশের ভাষাবিজ্ঞানীরা সমাজভাষার সীমানা বিষয়ে যে সব মতামত দিয়েছেন

তাঁদের মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানী ফিশম্যানের মতামতকে আমরা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। ফিশম্যানের মতানুসারে সমাজভাষাবিজ্ঞানকে তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা–

ক. বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

খ. সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান

গ. প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানে ভাষার পরিকল্পিত প্রয়োগের দিকটি আলোচনা করা হয়। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উৎকৃষ্ট পদ্ধতির আবিষ্কার, অনুবাদ নিয়ে গবেষণা ও নীতি নির্ধারণ, বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার বাহন বা মিডিয়া নিয়ে গবেষণা, লিপি প্রণালীর উদ্ভাবন, পরিমার্জন ও সংশোধন ইত্যাদি বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়। সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞানে ইতিহাসের আলোকে ভাষাকে বিশ্লেষণ করা হয়। অর্থাৎ সমাজভাষার উদ্ভব কিভাবে হয়েছে? ভাষার বিবর্তন কোন পথে ঘটেছে? কী ভাবেই বা সমাজভাষা সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে সেই সব বিষয় এখানে আলোচিত হয়। প্রয়োগমূলক ও পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকার বাইরে সমাজ- ভাষাবিজ্ঞানের আর যা কিছু বিষয় তার সবই বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। ভাষা বিজ্ঞানী ফিশম্যান এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন। তিনি বলেন -- " Descriptive sociology of language seeks to answer to the question who speaks(or with), what language(what language variety) to whom and when and to what end?"[৬] এর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ। সমাজভাষার প্রেক্ষিতে বক্তা, শ্রোতা, ভাষা ব্যবহারের উপলক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, সমাজভাষার রূপ ইত্যাদি যদি বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের মূল সূত্র হয় তবে আমাদের গবেষণার বিষয়– ''দক্ষিণবঙ্গের কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতি'' অবশ্যই বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকাধীন।

সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চা- গবেষণার পরম্পরা

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য দেশে সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি সেই শাস্ত্রটির সূত্রপাত হয়। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত Sociolinguistics কথাটি ওদেশে অপ্রচলিত ছিলো। হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি ভাষার অধ্যাপক হ্যাভার সি কারি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে Sociolinguistics

(সমাজভাষাবিজ্ঞান) কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। তিনি Sociolinguistics বলতে ভাষা ও সামাজিক মর্যাদার পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝাতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন- "Social functions and significations of speech factors offer a prolific field of research...The field is now designated sociolinguistics."[৭]

ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারায় উইলিয়ান ব্রাইট এবং এ. কে. রামানুজন ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে Sociolinguistics কথাটি ব্যবহার করেন। অবশ্য একথা সত্য যে Sociolinguistics কথাটির ব্যবহার না থাকলেও পাশ্চাত্য দেশের ভাষাবিজ্ঞানীদের আলোচনায় এই বিষয়টির অনুরণন অনেক আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আলাদা করে সমাজভাষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক গবেষণা শুরু হয়। জে. বি. হোয়াইটমার আপাচে অভিবাদন রীতি নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক এবং তার সঙ্গে ভাষা সংগঠনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন পাওয়েল তাঁর "Introduction to the study of Indian language" নামক প্রবন্ধে। ঐ একই সময়ে ভাষার আঙ্গিনায় ভাষাবৈচিত্র্যের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন ভাষাবিজ্ঞানী এডোয়ার্ড সাপির। ১৯১৫ এবং ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে এডোয়ার্ড সাপিরের দুটো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ দুটি হল–

a. "Abnormal types of speech in Nootka"

b. "Male and female forms of speech in Yana".

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ভাষাবিজ্ঞানী ম্যালিনোওস্কির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ– "The problem of meaning in primitive languages" প্রকাশিত হয়। সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রথম পর্বের উল্লেখযোগ্য সংযোজন মেরী হাস রচিত– "Men's and women's speech in Koasati. (১৯৪৪) প্রবন্ধটিতে সমাজভাষার বিশেষ অধ্যায় হিসাবে নারী ভাষার আলোচনাও বিশেষ গুরুত্ব পায়। এখানে পুরুষের ভাষার সঙ্গে নারী ভাষার পার্থক্য বেশ স্পষ্ট ভাবে আলোচনা করা হয়।

সমাজভাষাতত্ত্ব নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে আলোচনার সূত্রপাত হয় বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাতে জোয়ার আসে। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে জে. আর. ফার্থ "Personality and language in society" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে ভাষার

উপর সমাজ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব আলোচনা করা হয়। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাকডেভিট মার্কিন নিগ্রোদের ভাষার সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটির নাম– "The relationship of the speech of American Negroas to the speech of Whites." ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইউ ওয়েনরাইস 'Language in Contact' নামে একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে চার্ল ফার্গুসনের বিখ্যাত রচনা 'Diglossia' প্রকাশিত হয়। এর পরে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাউন ও গিলম্যান লেখেন "The pronouns of power and solidarity" নামে একটি তথ্যবহুল বিশ্লেষণ ধর্মী প্রবন্ধ। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমাজভাষাবিজ্ঞানের এই যে প্রসার তা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। তবে এই সমস্ত আলোচনায় প্রচুর তথ্য ও বিশ্লেষণ উঠে এলেও সমাজভাষার তাত্ত্বিক দিকের আলোচনা বিশেষ প্রশ্রয় পায়নি। যা এই পর্বের আলোচনার একটি নেতিবাচক দিক। এই প্রসঙ্গে ড. পবিত্র সরকারের মূল্যায়ন যথার্থ। তিনি ম্যাকডেভিড ও অন্যান্যদের গবেষণা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন–

> ''তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের ঝোঁক মূলত ছিল তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, অর্থাৎ বর্ণনার দিকে। এমনকি ১৯৭০ এ যখন ম্যাকডেভিড *The sociology of language"* নামে প্রবন্ধ লেখেন তখনও তাঁর মনে বিষয়টির তাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন চিন্তা স্থান পায়নি।" [৮]

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে লস এঞ্জেলস এর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে sociolinguistics বিষয়ক সম্মেলনে সর্বপ্রথম সমাজভাষাবিজ্ঞানকে একটি তত্ত্ব হিসাবে ধরে নিয়ে তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করার প্রবণতা শুরু হয়। এই সম্মেলনে বহু ভাষাতাত্ত্বিকদের পঠিত প্রবন্ধে সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়, এর ক্ষেত্র, পরিধি বিষয়ে কিছু কিছু গঠনমূলক ধারণা প্রকাশ পায়। সম্মেলনে উপস্থিত ভাষাতাত্ত্বিকগণ এই সময় বিষয়টির প্রতি যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে প্রচেষ্টা খুব ফলপ্রসূ হয়নি। সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধগুলি উইলিয়ান ব্রাইট এর সম্পাদনায় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে "sociolinguistics" নামে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ভূমিকায় সম্পাদক সমাজ- ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার সময় শাস্ত্রটির তত্ত্ব অপেক্ষা সংজ্ঞা, সীমারেখা ইত্যাদি বিষয়ে বেশি

মনোযোগ প্রদর্শন করেন। তবে একথা সত্য যে এই সম্মেলনেই সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব সম্পর্কে সচেতনতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

লস এঞ্জেলস এর সম্মেলনে Sociolinguistics কে তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার যে প্রচেষ্টা লক্ষ করা গিয়েছিল, উত্তরকালে তা আরও বিস্তৃত হয়ে তাত্ত্বিক ভিত্তি পায় সমাজভাষাবিজ্ঞানী হ্যালিডে ও বার্নস্টাইনের প্রচেষ্টায়। তাঁরা স্যাপীর হোয়ফে'র 'linguistics relativity' এর প্রস্তাবকে মর্যাদা দিয়ে তাঁদের গবেষণা শুরু করেন এবং শেষপর্যন্ত চমস্কির ভাষার অধিকার বা Competence তত্ত্বের প্রতিস্পর্ধী রূপে সমাজভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা দেন। হ্যালিডে ও বার্নস্টাইনের প্রচেষ্টাকে আরও শক্ত ভীতের উপর দাঁড় করান জে. জে. গ্যাম্পার্য, ডেল হাইমস, জ্যোশুয়া ফিশম্যান, উইলিয়াম লেবোভ প্রমুখ সমাজভাষাবিজ্ঞানী। এঁদের লিখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থের সংখাধিক্য থেকে প্রতিপন্ন হয় সমাজভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রে তাঁদের অবদানের স্বরূপ।

জে. জে. গ্যাম্পার্য

সমাজভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রে জে. জে. গ্যাম্পার্যের উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল–

১. Language problem in the rural development of north India (1957)

২. Dialect differences and social stratification in a north Indian village (1958)

৩. Linguistic diversity in south Asia (1960 -ফার্গুসনের সঙ্গে যৌথ রচনা)

সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় গ্যাম্পার্যের শ্রেষ্ঠ অবদান– "Ethnography of Communication" তত্ত্ব। এই তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন "Whereas linguistic Competence Covers the speaker's ability to produce grammatically correct sentences, Communicative competence describes his ability to select from the totality of grammatically correct expressions available to him, forms which

appropriately reflect the social norms governing behaviors in specific Encounters," [৯] সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে Linguistic repertoire বা বুলিভাণ্ডার, এই পরিভাষাটি তাঁরই সংযোজন।

জ্যোশুয়া ফিশম্যান

সমাজভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে জ্যোশুয়া ফিশম্যান এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ভাষাবিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখায় তাঁর অবদান গুলি হল–

১. Who speakes what language to whom and when(1965)

২. Readings in the sociology of language.(1968)

৩. Advances in the sociology of language(1972)

সমাজভাষাবিজ্ঞানের ধারায় ফিশম্যানের উক্ত গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে অসাধারণ সংযোজন। এই গ্রন্থগুলির মাধ্যমে ফিশম্যান Sociology of language এর তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফিশম্যান দৃষ্টান্ত সহকারে দেখিয়েছেন মানুষ সমাজজীবনে Interaction বা অন্যোন্য ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কোনো একটি ভাষা ব্যবহার করে না। মানুষ কখনো বহুভাষা বা কখনো একটি ভাষার বিভিন্ন বুলি বা উপভাষা ব্যবহার করে। বিষয়টির তাৎপর্য হল কোনো বাক্ সম্প্রদায় পরিস্থিতি অনুযায়ী কথনরীতি প্রয়োগ করে। পরিস্থিতি, পরিবেশের পরিবর্তন হলে বাক্ সম্প্রদায় তাদের বাক্ রীতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসে। ফিশম্যানের মতানুযায়ী সামাজিক নানা প্রকার পরিস্থিতি বাক্ সম্প্রদায়ের বাক্‌রীতিতে পরিবর্তন আনে। সামাজিক পরিস্থিতির স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন– "The implementation of the rights and duties of a particular role relationship,in the place (locate) most appropriate or most typical for that relationship and the time societally defined as appropriate for that relationship" [১০]

ডেল হাইমস

সমাজভাষাবিজ্ঞানের ধারায় ডেল হাইমস এর বিখ্যাত রচনাগুলি হল–

১. The Ethnography of speaking.(1962)

২. Language in culture and society.(Ed 1964)

৩. Competence and performence in linguistic theory.(1971)

৪. Foundations of sociolinguistics : An Ethnographic approach (1974)

ডেল হাইমস তাঁর লেখালিখির দ্বারা সমাজভাষাবিজ্ঞানে Ethnography of speaking এর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজভাষাবিজ্ঞানের ধারায় Communicative Competence পরিভাষাটি তাঁরই সংযোজন। ডেল হাইমস এর মতে, কোনো মানুষ যখন কোনো একটি ভাষা বলতে শেখে, তখন কেবলমাত্র সেই ভাষার ব্যাকরণগত সূত্রাবলী শিক্ষাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। তাকে সেই ভাষাভাষী অঞ্চলের সমাজ পরিবেশ ও সামাজিক সংস্কৃতি সম্পর্কেও সম্যক অবগত থাকতে হয়। ভাষার ব্যাকরণগত সূত্রাবলীর পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ে ভাববিনিময় বা বাক্ প্রয়োগকে ডেল হাইমস Ethnography of sepeking বা কথনের নিবৃত্ততত্ত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। ডেল হাইমস তাঁর সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় Ethnography of speaking এর কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি সেখানেই থেমে থাকেননি। পরবর্তীতে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ভাষাশিক্ষায় কথনের চেয়ে সংজ্ঞাপনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই শেষপর্যন্ত তিনি গ্যাম্পার্যের তত্ত্ব মেনে নেন, এবং ঐ তত্ত্বের নতুন নামকরণ করেন–"Ethnography of communication" এই সম্পর্কে তাঁর নতুন ধারণা– "It is not that linguistics does not have a vital role. Analysed linguistic materials are indispensable, and the types of linguistic methodology is an influence in the ethnographic perspective. It is rather that it is not liguistics, but ethnography, not language, but communication, which must

provide its frame of reference within which the place of language in culture and society is to be assessed." [১১]

উইলিয়াম লেবোভ

সমাজভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনায় উইলিয়াম লেবোভ এর সংযোজন–

১. The Social Stratification of English in New York City(1966)

২. The Study of language in it Social context.(1971)

৩. Hypercorrection by the lower middle class as a factor in linguistic change.(1972).

সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে লেবোভ নতুন কোনো তত্ত্ব সংযোজন করেননি। কিন্তু তবুও সমাজভাষাবিজ্ঞানের ধারায় তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে Martha's vineyard দ্বীপের ভাষা নিয়ে কাজ করার সূত্রে তিনি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যভেদে House শব্দের উচ্চারণ বৈচিত্র্য (হৌস এবং হাউস) এর সন্ধান দেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে তাঁর এ কাজ অবশ্যই মৌলিক। তাঁর এই গবেষণারই সম্প্রসারিত রূপ -''The Social Stratification of English in New York City(1966)"। এখানে লেবোভ বয়স, পেশা এবং রোজগার এই তিনটি মানদণ্ডের সাহায্যে নিউ ইয়ার্কের ভাষিক এককে তিনটি প্রধান সমাজ উপভাষায় ভাগ করেন। আর এরই সাপেক্ষে /r/ধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য লক্ষ করেন। লেবোভের এই বিশেষ গবেষণাকর্ম সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের বাইরেও আরও অনেকে সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারায় কিছু কিছু ভূমিকা নিয়েছেন। এঁরা হলেন-বেসিল বানর্স্টেন, উইলিয়ান ব্রাইট, আরভিন-ট্রিপ, পিটার ট্রডগিল, চেম্বার্স, হাউগেণ প্রমুখ।

বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান ও কৃষিকেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতি

'Ethnography of speaking' এ ডেল হাইমস বলেছেন যে, কোনো কথা বা বক্তব্যের চরিত্র নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর, বিষয় গুলি হল– বক্তা (Senders),শ্রোতা (Receiver) ,এবং উদ্দেশ্য (Setting)। কথা বা বক্তব্যের প্রধান বিষয় হল বক্তা। সামাজিক পরিবেশে একজন বক্তার একাধিক পরিচয় বর্তমান। লিঙ্গভেদ, বয়সভেদ, শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদ, কর্মভেদে বক্তার পরিচয় পরিবর্তিত হয়। প্রত্যেকটি পরিচয়ের ভিত্তিতে বক্তার Sociolect বা সামাজিক উপভাষার রূপ পরিবর্তিত হয়। তাই বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো সমাজভাষাবিজ্ঞানীর গবেষণা শুরু হয় বক্তার সামাজিক পরিচয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে। কোনো ব্যক্তি যে সবসময় তার প্রকৃতি অনুযায়ী কথা বলবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ত তার একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু মহলে কথা বলার সময় প্রচুর পরিমাণে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করছে। ঐসব শব্দ সে সচারচর ব্যবহার করে না। আবার কোনো অশিক্ষিত লোককে শিক্ষিত লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় একেবারে মার্জিত ভাষায় কথা বলতে দেখা যায়। ভাষাবিজ্ঞানী ম্যাকডেভিড উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন–সম্পন্ন পরিবারের বাটলার বা ফ্লাটের স্টুয়ার্ডরা, মার্কিন দেশের অভিজাত পরিবারের কৃষ্ণকায় রাধুনী বা পরিবেশনকারীরা যে ধরনের শুদ্ধ ইংরাজি বলে তাদের মালিকরা কখনই তেমন ইংরাজি বলে না। অর্থাৎ কেবলমাত্র শ্রেণি পরিচয় দিয়েই কোনো ব্যক্তির ভাষার স্বরূপ যথাযথ ভাবে নির্ধারিত হতে পারে না। তাই একজন সমাজভাষাবিজ্ঞানীকে সমাজভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বহুবিধ বিষয় খতিয়ে দেখতে হয়।

সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে বক্তার পরিচয় যেমন পাল্টে যায় তেমনি শ্রোতার পরিচয়ও পাল্টে যায়। একজন শ্রোতা সময়ভেদে বন্ধু, গুরুজন, প্রেমিক, প্রেমিকা প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত হয়। শ্রোতার সামাজিক পরিচয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষাছাঁদ বদলে যায়। আমরা বন্ধুদের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলি, গুরুজনদের সঙ্গে সে ভাষায় কথা বলি না। অর্থাৎ যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে তার সামাজিক পরিচয়ের উপর নির্ভর করে ভাষাছাঁদ বদলে যায়। কোনো সন্দেহ নেই শ্রোতার সামাজিক তথা ব্যক্তিক মানদণ্ড বক্তার ভাষারীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বিশিষ্ট ভদ্রজনের সঙ্গে কথা বলা আর বাড়ির কাজের লোকের সঙ্গে কথা বলার ধরন একরকম হয় না। শ্রোতার সামাজিক পদমর্যাদা অনুযায়ী

কথা বলতে পারাকেই বলা হয় ভাববিনিময় যোগ্যতা। এই প্রসঙ্গে স্যাভিল ট্রোইক এর একটি বক্তব্য উল্লেখযোগ্য–'' Communicative competence involves knowing not only the language code, but also what to say to whom and how to say it appropriately in any given situation. It deals with the social and cultural knowledge, speakers are presumed to have to enable them to use and interpret linguistic forms.''[১২] একজন সমাজভাষাবিজ্ঞানীকে জানতে হবে শ্রোতার ব্যক্তিক ও সামাজিক পরিচয় সম্পর্কে। ভাষার যথাযথ পরিচয় পাওয়ার জন্য কে বলছে অর্থাৎ বক্তা এবং যাকে বলা হচ্ছে অর্থাৎ শ্রোতা উভয়ের মূল্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজভাষাবিজ্ঞানী ব্রাইট, ডেল হাইমস প্রমুখ সমাজভাষাবিজ্ঞানের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হিসাবে বিবেচনা করেছেন উপলক্ষ্য বা setting কে। setting বলতে বোঝায় ভাষা ব্যবহারের উপলক্ষ্যকে। কোন পরিস্থিতিতে কথা বলা হচ্ছে সেটাই হল setting। সামাজিক মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে কথা বলে। আমরা সাধারণভাবে যে ভাবে কথা বলি, রেগে গেলে বা বিরক্ত হলে সেই ভাবে কথা বলি না। স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে আমরা সাধারণভাবে হয়ত বলি–''এক গ্লাস জল দাও'', কিন্তু ঐ কথাটিই রেগে গেলে আমরা বলি– '' এক গ্লাস জল দিতে বলছি শুনছো না'', আবার এই কথাটিই ভালোবাসার মূহুর্তে বলা হয়–''এই এক গ্লাস জল দাও না''। বোঝাই যাচ্ছে বিভিন্ন মানসিকতার উপর ভিত্তি করে ভাষাছাঁদ বদলে যাচ্ছে। আমাদের দ্বারা কথিত ঝগড়ার ভাষা, বক্তৃতার ভাষা, প্রেমের ভাষা বা ক্লাস রুমের ভাষা একরকম নয়। উপলক্ষ্য অনুযায়ী ভাষাছাঁদ বদলে যায়। পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষাছাঁদ বদলে যাওয়া প্রসঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানী মৃণাল নাথ বলেন-- ''কোনো ব্যক্তি বিশেষের ভাষিক ব্যবহার কোনোমতেই একরূপ (uniform) নয়। ভাষিকভাবে একই রকমের পরিস্থিতি মনে হতে পারে বটে, কিন্তু সে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কথা বলবে (বা লিখবে)--এই পরিস্থিতিকে বলা হয় সামাজিক পরিস্থিতি। সে বেশ কিছু সংখ্যক সুস্পষ্ট রেজিস্টার ব্যবহার করবে।'' [১৩]

পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষাছাঁদ বদলে যায়, এই বদলে যাওয়াকে অর্থাৎ ভাষার Shifting কে সমাজভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় Code Switching। বর্ণনামূলক সমাজ

ভাষাবিজ্ঞানে Code Switching এর তাৎপর্য প্রচুর। কেবলমাত্র বক্তা ও শ্রোতার উপর নির্ভর করে ভাষার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না, ভাষার যথার্থ স্বরূপ বোঝা যায় ভাষার সিচুয়েশন বা Setting অনুযায়ী ভাষাকে বিশ্লেষণ করে। যখন বক্তা, শ্রোতা এবং উপলক্ষ্য এই তিনের ভিত্তিতে ভাষাকে বিশ্লেষণ করা যায় তখনই সমাজভাষার স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়। বক্তা ও শ্রোতা'র পারস্পরিক পরিচয় এবং তৎসূত্রে গঠিত পরিস্থিতি ভাষাছাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক পরিবেশে একজন বক্তা বিভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত হতে পারে। কখনো সে শিক্ষক, আবার কখনো ডাক্তার, উকিল, শ্রমিক, কৃষক, কখনো নারী অথবা পুরুষ। লিঙ্গভেদে, ভাষাভেদ অতি পরিচিত বিষয়। কর্মকেন্দ্রিক মানুষের যে পরিচয় সেই পরিচয়ের উপর নির্ভর করেও ভাষাপরিবর্তিত হয়। তাই একজন ডাক্তারের ভাষার সঙ্গে একজন শ্রমিকের ভাষার পার্থক্য তৈরি হয়। কর্মকেন্দ্রিক বিষয় মানুষের ভাষার উপর প্রবল ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন–'ওলন' শব্দটি রাজমিস্তিরিদের কর্ম সংস্কৃতি জাত শব্দ। তাই কোনো রাজমিস্তিরি কাজ করার সময় মাপ জোকের জন্য 'ওলন দিয়ে মাপা' কথাটি ব্যবহার করে। কিন্তু এই শব্দটি কখনই ডাক্তাররা ব্যবহার করে না। ডাক্তারী শাস্ত্র পড়তে হয় সম্পূর্ণ ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে। ফলে ডাক্তারদের কথায় ইংরাজি শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা প্রবল। অন্যদিকে কলা বিভাগের শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিকদের মধ্যে এই প্রবণতা কম। ডাক্তার, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষকরা তাদের কাজের জায়গায় কথা বলার সময় যে সব শব্দ ব্যবহার করে সেই সব শব্দ ব্যবহারে পার্থক্য আছে। কর্মকালীন সময়ে এরা যে যে শব্দ ব্যবহার করে, কাজের সময়ের বাইরে তা ব্যবহার করে না। বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানে Situation বা পরিস্থিতি একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। তাই পেশাকেন্দ্রিক ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ ছাড়া সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। কৃষিকাজ মানুষের বহু প্রাচীন জীবিকা। তাই কৃষিকেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির আলোচনা সমাজভাষাবিজ্ঞানের গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে আমরা মনে করি।

তথ্যসূত্র

১. শ', রামেশ্বর , সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা , পুস্তক বিপণি , কলকাতা , ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ:৬৯৬

২. Bright , Willian (Chief ed.), International Encyclopaedia of ling,

vol-4, oxford uni. press, 1994

৩. শ', রামেশ্বর , সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা , পুস্তক বিপণি , কলকাতা , ১৪২৫ বঙ্গাব্দ , পৃ: ৬৯৬

৪. হুমায়ুন, রাজীব, সমাজভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ: ১১

৫. উদ্ধৃত; হুমায়ুন, রাজীব, সমাজভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ: ২০

৬. উদ্ধৃত; হুমায়ুন, রাজীব, সমাজভাষাবিজ্ঞান, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১, পৃ: ২০

৭. উদ্ধৃত; আলি, রমজান, ভাষার ইতিহাস ও আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, সদ্-উ--তন্-উ প্রকাশনী, বর্ধমান, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ

৮. সরকার, পবিত্র, ভাষা-দেশ-কাল, জি. এ. ই পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫

৯. উদ্ধৃত; নাথ, মৃণাল, ভাষা ও সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ: ১৯-২০

১০. J.A. Fishman (Ed.) Advances in the sociology of language I , The Hague, Mouton, 1971

১১. উদ্ধৃত; নাথ, মৃণাল, ভাষা ও সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ: ১৮

১২. Troike, Saville, Ethnography of Communication, Oxford : BasilBlackwell, 1982

১৩. নাথ, মৃণাল, ভাষা ও সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ: ৬০